আর্থ-সামাজিক বিন্যাস ও উন্নয়ন উদ্বাস্তু : ফুলবাড়ী বড়পুকুরিয়া অঞ্চলের সমীক্ষা-২

অনুবাদ: জায়েদ বিন সাত্তার

মূল গ্রন্থ: *Agony of Development: A Study in Pauperization of Displaced Communities* । সম্পাদক: ড. মিজানুর রহমান । প্রকাশক: ELCOP, ঢাকা ২০০৬

সাঁওতালদের ব্যয়ের ধরনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়েছে। তাদের ব্যয়ের ধরন মূলধারার অর্থনৈতিক কাঠামো অনুসরণ করতে শুরু করেছে। বিশ্বায়নই এই পরিবর্তনের পেছনে মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। এর পাশাপাশি খ্রিস্টধর্মের বিস্তার এবং নগর আগ্রাসন এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে।

বাঙালিদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবার কারণে সাঁওতালদেরকে এখন স্থানীয় প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রবেশ করতে হচ্ছে। ফলে তাদের পোশাক, দৈনিক খাদ্যাভ্যাস, খেলাধুলা ইত্যাদিতে ধীরে ধীরে বাজার নির্ভরতার ছাপ তৈরি হচ্ছে। তাত্ত্বিকভাবে ভোক্তার কেনাকাটার ধরন নির্ভর করে তার আবাসস্থলের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর। আমাদের গবেষণার এলাকাগুলোতে আমরা লক্ষ করেছি স্থানীয় সাঁওতালরা এখন প্রায়ই কোকা-কোলা, পেপসি, সিগারেট, বিস্কুট ইত্যাদি ক্রয় করেন; অনেকে মোবাইল ফোনও ব্যবহার করেন। কিছু খ্রিস্টান সাঁওতাল পরিবারকে আমরা পারফিউম, প্রসাধনী এবং অন্যান্য টয়লেট্রিজ সামগ্রী ব্যবহার করতে দেখেছি।

সাঁওতালদের ব্যয়ের ধরন পরিবর্তনের দুই ধরনের প্রভাব আছে–১. অর্থনৈতিক প্রভাব, ২. সামাজিক প্রভাব। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে সাঁওতালদের কেনাকাটার ধরন ও ব্যয় বাড়লেও তাদের আয় কিন্তু সেভাবে বাড়েনি। এই অতিরিক্ত ব্যয় মেটানোর জন্য তাদের প্রায়ই নিজেদের জমিজমা, গবাদি পশু, গাছপালা ইত্যাদি বিক্রি করতে হচ্ছে। এতে তাদের আর্থিক অবস্থা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে। এছাড়া ব্যয়ের ধরন পরিবর্তিত হবার ফলে সাঁওতালদের মাঝে আগে যে সামাজিক বন্ধন ও সম্প্রীতি ছিল সেটিও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে। প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইনে সাঁওতালদের গোত্রভিত্তিক মালিকানার কোন স্বীকৃতি নেই। ফলে সাঁওতাল সমাজে ব্যক্তিমালিকানার বিকাশ ঘটা শুরু হয়েছে এবং ব্যক্তিমালিকানার বিকাশের সাথে সাথে তাদের সমাজে নানা ধরনের স্তরভাগ তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন স্তরের সদস্যদের মাঝে ভোগের মাত্রাগত পার্থক্য থাকার ফলে সাঁওতাল সমাজে ব্যক্তিবাদ বিকশিত হচ্ছে। ভোগের মাত্রাগত ভিন্নতা সমাজকে চাহিদা ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে বিভাজিত করে তোলে। তাই ব্যক্তিপর্যায়ে ভোগের পরিমাণ যত বাড়বে সমাজও তত বেশি ব্যক্তিবাদী হয়ে উঠবে।[১৫]

একটি সংস্কৃতির লক্ষ্য, চিন্তাধারা ও মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয় সেই সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। খোরাকি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবেশ, প্রকৃতি এবং বাস্তুতন্ত্রকে বেশ গুরুত্বের সাথে দেখা হয়; কারণ এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিক সম্পদের নবায়ন এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর ভিত্তি করে। অন্যদিকে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সম্পদ বৃদ্ধি ও ভোগের লক্ষ্য নিয়ে; তাই এটি প্রকৃতি ও বাস্তুতন্ত্রকে ধর্তব্যের মাঝে নেয়নি। বাজারভিত্তিক অর্থনীতি এবং নগর আগ্রাসনের ফলে সাঁওতালদের অরণ্যনির্ভর সংস্কৃতি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রকৃতির সাথে আত্মিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ককে খুবই গৌণভাবে দেখা হয়। তাই পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে প্রকৃতির সাথে সাঁওতালদের যে যোগাযোগ সেটিও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

৬. পুরনো সংস্কৃতির জায়গায় নতুন সংস্কৃতির আগমন

সংস্কৃতি একটি বহুমাত্রিক শব্দ। যেসব মূল্যবোধ এবং প্রথার ভিত্তিতে মানুষ জীবনধারণ করে সেগুলোকেই আমরা সংস্কৃতি বলি। ধর্ম, ভাষা, গান, গল্প, উৎসব, সাহিত্য, খাদ্যাভ্যাস, নিজেদের মধ্যকার বন্ধন, নিজেদের শেকড়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা–এসব মিলিয়েই আমাদের সংস্কৃতি। এগুলো নিয়েই আমরা বেঁচে থাকি।[১৬] বাঙালিদের ক্ষেত্রে নিজেদের পৈতৃক জমি এবং প্রচলিত পেশা হতে উৎখাত হওয়ার ফলাফল নিয়ে আগেই আমরা আলোচনা করেছি। বাঙালিরা স্বভাবগতভাবে বেশ করিতকর্মা হবার কারণে তারা সহজেই বিভিন্ন পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে তারা রাষ্ট্রেরও সহযোগিতা পায়। তবে সাঁওতালদের ক্ষেত্রে বিষয়গুলো এরকম নয়। মূলধারার জনগোষ্ঠীর কাছে রাজনীতি ও অর্থনীতি যতটা গুরুত্বপূর্ণ, সংস্কৃতি ঠিক ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছে তাদের সংস্কৃতি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতি তাদের কাছে রক্তপ্রবাহের মতই অপরিহার্য; কারণ তাদের সংস্কৃতি তাদের একটা স্বতন্ত্র পরিচয় বহন করে।[১৭] তাই আদিবাসীদের সংস্কৃতিতে কোন ধরনের পরিবর্তন এলে সেটি তাদের পরিচিতি এবং অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

৬.১ বাঙালি সমাজে সাংস্কৃতিক চর্চার পরিবর্তন

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি এবং মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্পের এলাকাগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাঙালি তাদের পৈতৃক ভূমি এবং পেশা থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলে সেখানকার সমাজে নতুন এক ধরনের সামাজিক স্তরবিন্যাস তৈরি হয়েছে। যখন কোন সমাজের অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারে পরিবর্তন আসে তখন সেই সমাজের সংস্কৃতিও পরিবর্তিত হয়।[১৮] স্থানান্তরিত হবার ফলে সমাজের সদস্যদের মাঝে আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ, আত্মীয়তার সম্পর্ক, প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি নানা বিষয়ে পরিবর্তন আসে। এ বিষয়গুলোকে সংখ্যায় পরিমাপ করা যায় না, তবে এদের প্রভাব বোঝা যায় এবং এর ফলে একটা সংস্কৃতি যে ক্রমে নিঃশেষিত হবার পথে এগিয়ে যাচ্ছে সেটি টের পাওয়া যায়। নিজ বাস্তুভিটা ত্যাগের বিষয়টি অনেক সময়ই মানসিক পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়; পুরনো দিনের স্মৃতি মনকে দুঃখভারাক্রান্ত করে তোলে। বাঙালিরা স্বভাবগতভাবে একটু বেশি আবেগপ্রবণ। তাই পুরনো দিনের স্মৃতি তাদের কষ্টবোধের মাত্রা আরও বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে। এ ধরনের মানসিক ক্ষতির কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দেয়া বা পুনর্বাসন করা সম্ভব নয়। মাঠকর্মের সময় আমরা দেখেছি খনি শ্রমিকদের কোন

সাপ্তাহিক ছুটি নেই। এমনকি ঈদের দিনও তাদের কাজ করতে হয়। এটা তাদের জন্য বড় ধরনের একটি সাংস্কৃতিক ধাক্কা। এছাড়া বিশ্বায়নের ফলে আমাদের মাঝে শহর তৈরির প্রবণতা বেড়েছে। ভোগবাদ ও ব্যক্তিবাদ শহুরে সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ । তাই শহরের বিকাশের সাথে সাথে সমাজে ভোগবাদী ও ব্যক্তিবাদী প্রবণতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সমাজে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। মাঠকর্মের সময় আমরা আমাদের গবেষণার এলাকাগুলোতেও এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ করেছি।

৬.২ সাঁওতাল সমাজে সাংস্কৃতিক চর্চার পরিবর্তন

উচ্ছেদ/স্থানান্তরের ফলে সাঁওতালদের সংস্কৃতিতে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে সেটি দেখতে হলে আমাদেরকে উচ্ছেদ/স্থানান্তরের আভিধানিক অর্থের বাইরে গিয়ে বিষয়টি আরও ব্যাপকভাবে দেখতে হবে। সাঁওতালদের জন্য উচ্ছেদ/স্থানান্তরিত হওয়াকে একটি 'ঘটনা' হিসেবে না দেখে 'প্রক্রিয়া' হিসেবে দেখা যুক্তিসংগত। এই 'প্রক্রিয়া'টি বসতভিটা থেকে স্থানান্তরের মাধ্যমে শুরু হয় এবং স্থানান্তরিত হওয়ার পরেও চলমান থাকে।[১৯] প্রস্তাবিত ফুলবাড়ী কয়লা খনি প্রকল্পের ফলে বিপুলসংখ্যক সাঁওতালকে তাদের বাসভূমি হারাতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের যদি বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন এলাকা কিংবা শহরে পুনর্বাসিত করা হয় তাহলে তারা বেশ বিপদের মুখে পড়বে। সামাজিক বন্ধন ও গোষ্ঠীবদ্ধতা সাঁওতাল সমাজের মূল ভিত্তি। তাই তাদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে মফস্বল বা উপশহর এলাকাগুলোতে পুনর্বাসিত করা হলে সেই সামাজিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাদের সমাজ কাঠামোটাই পালটে যাবে। এছাড়া সাঁওতালদের বসবাসের এলাকাগুলোতে বাঙালিদের অনুপ্রবেশের ফলে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিও মূলধারার সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। ফলে সাঁওতালদের আদি জীবনধারা ব্যাহত হচ্ছে এবং সেখানে নানা ধরনের পরিবর্তন আসছে। এর বাইরে খ্রিস্টধর্মের বিস্তারের কারণেও তাদের নানা আচার ও রীতিনীতিতে পরিবর্তন এসেছে। মোটকথা স্থানান্তরের ফলে সাঁওতালদের সংস্কৃতিতে কী ধরনের পরিবর্তন আসছে/এসেছে সেটি পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদের কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে, যেমন– স্থানান্তরের ফলে সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন এসেছে এবং সেটি কীভাবে এসেছে; বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতি তাদের আদি সংস্কৃতির ওপর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করছে; খ্রিস্টধর্মের প্রসারের ফলে কীভাবে তাদের জীবনধারা পরিবর্তিত হচ্ছে এবং সেখানে কীভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটছে; আর সব শেষে রাষ্ট্র কেন এবং কীভাবে পুরো প্রক্রিয়াটিতে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করছে? সুতরাং কেবলমাত্র সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা আমাদের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট নয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিকের পাশাপাশি সাঁওতালদের প্রতি রাষ্ট্রের বিরূপ মনোভাবকেও আমাদের এই আলোচনায় তুলে আনতে হবে।

> এছাড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রকৃতির সাথে আত্মিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ককে খুবই গৌণভাবে দেখা হয়। তাই পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে প্রকৃতির সাথে সাঁওতালদের যে যোগাযোগ সেটিও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

৬.৩ সাঁওতাল সংস্কৃতির কিছু অত্যাবশ্যকীয় দিক

আমাদের গবেষণার মূল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে সাঁওতাল সংস্কৃতি সম্পর্কে খানিকটা জেনে নিলে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারব স্থানান্তরের ফলে সাঁওতালরা তাদের সংস্কৃতির কী কী হারিয়েছে এবং কতটুকু হারিয়েছে।

সাঁওতালরা প্রোটো-অস্ট্রেয়লয়েড জাতি থেকে উদ্ভূত।[২০] তাদের গায়ের বর্ণ কৃষ্ণকায়, উচ্চতা মাঝারি, চুল কালো ও কোঁকড়ানো। মুণ্ডা, ওঁরাও এবং পাহাড়িয়াদের সাথে তাদের শারীরিক ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য আছে। সাঁওতালরা প্রকৃতিভিত্তিক দেবতার পূজারি। তাদের প্রধান দেবতা সিং বঙ্গা (সূর্যদেবতা)। তারা মারাং বুদুকেও (পাহাড়দেবতা) একজন দেবতা হিসেবে সম্মান দেয়।[২১] সাঁওতালদের বিশ্বাস–আত্মা অবিনশ্বর এবং সিং বঙ্গা জগতের ভাল-মন্দ নির্ধারণ করেন। তাই তাদের দৈনিক প্রার্থনায় সিং বঙ্গা বেশ গুরুত্ব পায়। সাঁওতালরা পুনর্জন্ম বা স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস করে না, তাদের সকল প্রার্থনা পার্থিব উন্নতিকে কেন্দ্র করে।

সাঁওতালরা উৎসবপ্রিয় জাতি। তাদের বছর শুরু হয় ফাল্গুন মাসে (১৫ ফেব্রুয়ারির কাছাকাছি)। প্রায় প্রতি মাসেই তাদের কোন না কোন নাচ বা গানের অনুষ্ঠান থাকে। সাঁওতালরা ফাল্গুনে শিয়ালসেই, চৈত্রে বুঙ্গা-বুঙ্গী, আশ্বিনে দিবি এবং পৌষের শেষে সোহ্রাই উৎসব পালন করে। যেহেতু তাদের মূল পেশা কৃষিকাজ, তাই তাদের উৎসবের সময়সূচি কৃষিচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে জড়িত। সোহ্রাই উৎসব সাঁওতালদের জন্য একটি জাতীয় উৎসবস্বরূপ। এটি অত্যন্ত ধুমধামের সাথে উদযাপিত হয়। ফসলের দেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এটি পালন করা হয়। বসন্তকে স্বাগত জানানোর জন্য সাঁওতালরা বাহা উৎসব উদযাপন করে।

সাঁওতালরা মানুষ হিসেবে খুবই সৎ ও পরিশ্রমী, তবু দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। তাদের সহজ-সরল জীবনধারার মত তাদের পোশাকও সহজ-সরল। সাঁওতাল নারীরা ছোটখাট স্বল্প বসনের রঙিন শাড়ি পরে। আর সাঁওতাল পুরুষরা সাধারণত নেংটি বা গামছা পরে; তুলনামূলক সচ্ছলরা লুঙ্গি বা ধুতি পরে।[২২] সাঁওতালদের প্রধান খাবার ভাত, মাছ ও সবজি। তারা কাঁকড়া, শূকর, মুরগি, গরু এবং কাঠবিড়ালির মাংস খায়। সাঁওতালরা শূকর পালে। হাদিয়া বা পাচাই (ভাত পচানো মদ) তাদের প্রিয় পানীয়। এটি তাদের উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সাঁওতাল সমাজে তালাক দেয়া স্বীকৃত। সমাজে যৌতুক প্রথা বিদ্যমান থাকলেও এর পরিমাণ খুবই সামান্য। সাঁওতালদের নিজেদের গোত্রের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ।[২৩] বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্তা নারীদের পুনর্বিবাহ করার অধিকার আছে। সাঁওতাল সমাজ পিতৃতান্ত্রিক, তবে পরিবারে নারীদের ভূমিকা কোন অংশেই কম নয়।

সাঁওতালদের ঘর সাধারণত কাদামাটির তৈরি এবং আকারে ছোট হয়। তাদের উঠান যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সাঁওতাল নারীরা নানা রকম ছবি এঁকে এবং নকশা করে ঘরের দেয়ালগুলো সাজিয়ে তোলে। তাদের ঘরের আসবাবপত্র বেশ সাদামাটা।

সাঁওতালরা বাংলা ও অস্ট্রিক ভাষায় ভাব প্রকাশে সাবলীল। সাঁওতালদের লিখিত কোন সাহিত্য নেই, কিন্তু তাদের লোকসংগীত এবং লোকগাঁথার বিশাল সম্ভার রয়েছে।[২৪] সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা আছে, কিন্তু বর্ণমালা নেই; ধর্ম আছে, কিন্তু ধর্মগ্রন্থ নেই। আগে সাঁওতালদের মাঝে শবদেহ পোড়ানোর রীতি থাকলেও এখন মৃতদেহ সমাহিত করার রীতি প্রচলিত হয়েছে। এছাড়া মৃতের প্রতি সম্মান জানিয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করার চর্চাও আছে সাঁওতাল সমাজে।

৬.৪ সাঁওতালদের মাঝে খ্রিস্টধর্মের বিস্তার এবং তাদের সংস্কৃতিতে এর প্রভাব

আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, সাঁওতাল সংস্কৃতির সাথে তাদের ধর্মের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। তাদের প্রথাগত চর্চা, উপাসনা, উৎসব এবং অনুষ্ঠানের সাথে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই নিজস্ব ধর্ম থেকে বিচ্যুতি ঘটলে সাঁওতালদের ওপর সেটির একটি সামাজিক প্রভাব থাকবে। মাঠকর্মের সময় আমরা দেখেছি, অনেক সাঁওতালই ইতোমধ্যে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে এবং অনেকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বা নিচ্ছে। সুতরাং আমাদের গবেষণার প্রশ্ন হলো–১. কেন সাঁওতালদের মাঝে খ্রিস্টধর্ম বিস্তৃতি লাভ করছে? ২. এটি কীভাবে তাদের সংস্কৃতিতে পরিবর্তন নিয়ে আসছে?

বাইবেলের (গসপেল) বাণী প্রচারে নিয়োজিত সংঘবদ্ধ ধর্মযাজকরা এদেশে খ্রিস্টান মিশনারি হিসেবে পরিচিত।[২৫] আঠারো শতকে ব্রিটিশ প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারিদের আগমনের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে তাদের বিচরণ শুরু হয়। এ সময়টা (আঠারো শতক) ছিল ইউরোপীয়দের উপনিবেশ বিস্তৃতির স্বর্ণযুগ। উপনিবেশভুক্ত অঞ্চলগুলোতে পশ্চিমাদের ব্যবসা এবং সাংস্কৃতিক প্রাধান্য এসময় দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। একদিকে উপনিবেশের বিস্তৃতি এবং অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি–এ দুয়ে মিলে এ অঞ্চলে মিশনারিদের জন্য খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। খ্রিস্টধর্মের সাথে এই উপমহাদেশের প্রচলিত ধর্মগুলোর সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের ফলে মিশনারিরা মুসলমানদের প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়। একেশ্বরবাদী মুসলিমরা ত্রিসত্তার বিশ্বাসের ওপর স্থাপিত খ্রিস্টধর্মকে মেনে নিতে পারেনি।[২৬] খ্রিস্টান মিশনারিদের মূল উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্মের প্রসারের মাধ্যমে বাঙালি সমাজের বিদ্যমান সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ধারা পরিবর্তন করে ভারতীয় ও পশ্চিমাদের মাঝে একটি সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপন করা। তবে তাদের এ উদ্দেশ্য কখনও পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। মূলধারার বাঙালিরা মিশনারিদের দ্বারা সেভাবে প্রভাবিত হয়নি। তাই মিশনারিদের মনোযোগ ছিল সমাজবিতাড়িত কিংবা আদিবাসী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর। সে সময় সাঁওতালরা সবচেয়ে বড় আদিবাসী গোষ্ঠী হওয়ার কারণে তারা সাঁওতালদের মাঝে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ব্যাপারে মনোযোগী হয়। সাঁওতালদের কোন সুনির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ না থাকায় এবং ধর্মের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান সীমিত হওয়ার কারণে খ্রিস্টান মিশনারিরা সহজেই তাদের প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়। তাদের দারিদ্র্য এবং আর্থ-সামাজিক দুর্বলতাকে পুঁজি করে মিশনারিরা সাঁওতালদের মাঝে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজ শুরু করে। এর প্রাথমিক ধাপ হিসেবে তারা সাঁওতালদের মাঝে শিক্ষার প্রসার ঘটায়।[২৭] সেসময় ঔপনিবেশিক সরকারও তাদের এই উদ্যোগে সহযোগিতা প্রদান করে; কারণ ব্রিটিশ শাসকরা ভেবেছিল আদিবাসীরা যদি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয় সেখান থেকে ভবিষ্যতে বিদ্রোহ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা কমে যাবে এবং সরকারের পক্ষে আদিবাসীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেয়া সহজ হবে।

সাঁওতালদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পেছনে মহৎ কোন উদ্দেশ্য ছিল না, তাদের জন্য এটি ছিল প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে টিকে থাকার একটি কৌশল মাত্র। রাষ্ট্র সাঁওতালদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে কোণঠাসা করে ফেলার কারণে মিশনারিদের কার্যক্রম সাঁওতালদের মাঝে বেশ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। সাঁওতালরা তাদের ত্রাতা হিসেবে ভাবতে শুরু করে। সাঁওতালদের প্রতি রাষ্ট্রের বিরূপ আচরণ বাড়ার সাথে সাথে সাঁওতালদের চার্চমুখী হওয়ার হারও বাড়তে থাকে। আমাদের মাঠকর্মের সময় আমরা দেখেছি, খ্রিস্টান সাঁওতালরা অন্য সাঁওতালদের তুলনায় আর্থিকভাবে সচ্ছল। মিশনারিরা সাঁওতাল ছাত্রদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য বিষয়ে সহায়তার পাশাপাশি তাদের জন্য বৃত্তিরও ব্যবস্থা করত। তারা প্রয়োজনের সময় সাঁওতালদের ঋণ প্রদান করত এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের জন্য চাকরির ব্যবস্থাও করে দিত। খ্রিস্টান সাঁওতালদের এসব সুযোগ-সুবিধা পেতে দেখে অন্য সাঁওতালরাও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে অনুপ্রাণিত হতে থাকে।

খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে সাঁওতালদের সংস্কৃতিতে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে সেটি আমরা এখন দেখার চেষ্টা করব। অনেক সাঁওতাল খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে সাঁওতাল সমাজে নতুন ধরনের সামাজিক স্তরভাগ তৈরি হয়েছে এবং তাদের মাঝে যে সাংস্কৃতিক একরূপতা ছিল সেটি নষ্ট হয়ে গেছে। সমাজের এক অংশ খ্রিস্টধর্ম এবং অন্য অংশ সাঁওতালদের নিজস্ব ধর্ম চর্চা করার ফলে সাঁওতালদের নিজেদের মাঝে এক ধরনের সাংস্কৃতিক (ধর্মীয়) বিভাজন তৈরি হয়েছে; ফলে তাদের নিজেদের মধ্যকার সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ছে। খ্রিস্টধর্মের নিজস্ব একটি ধর্মীয় সংস্কৃতি আছে। ধর্মান্তরিত সাঁওতালদের সেই সংস্কৃতি অনুসরণ করতে হয়। ফলে তাদের আদি সংস্কৃতির সাথে তাদের যোগাযোগ ক্রমেই কমে যাচ্ছে।[২৮] ধর্মান্তরিত সাঁওতালদের বিয়ে এবং বিচ্ছেদ এখন খ্রিস্টধর্মের আইন অনুসারে সম্পাদিত হয়। এছাড়া ধর্মান্তরিত সাঁওতালরাও তাদের আদি আচার ও সংস্কৃতি পালনে তেমন একটা আগ্রহী না। তারা খ্রিস্টধর্মের আচার ও রীতিনীতি পালনেই বেশি মনোযোগী। খ্রিস্টান সাঁওতালরা এখন বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ইস্টার সানডে ও বড়দিন উদযাপন করে। এছাড়া খ্রিস্টধর্ম যেহেতু পশ্চিমা অঞ্চল থেকে এসেছে, তাই এর মাঝে পশ্চিমা সংস্কৃতির নানা উপাদান রয়েছে; ফলে খ্রিস্টান সাঁওতালদের মাঝে পশ্চিমা সংস্কৃতি গ্রহণ ও চর্চার পরিমাণ বেড়েছে।[২৯]

> সাঁওতালরা উৎসবপ্রিয় জাতি। তাদের বছর শুরু হয় ফাল্গুন মাসে (১৫ ফেব্রুয়ারির কাছাকাছি)। প্রায় প্রতি মাসেই তাদের কোন না কোন নাচ বা গানের অনুষ্ঠান থাকে। সাঁওতালরা ফাল্গুনে শিয়ালসেই, চৈত্রে বুঙ্গা-বুঙ্গী, আশ্বিনে দিবি এবং পৌষের শেষে সোহ্রাই উৎসব পালন করে। যেহেতু তাদের মূল পেশা কৃষিকাজ, তাই তাদের উৎসবের সময়সূচি কৃষিচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে জড়িত।

মাঠকর্মের সময় সাঁওতালদের নামকরণের ধারাতেও আমরা বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করেছি। ঐতিহ্যগতভাবে সাঁওতালদের নামকরণের নিজস্ব ধারা ছিল, যেটি অস্ট্রিক ভাষা থেকে এসেছিল। খ্রিস্টধর্মের বিস্তারের কারণে সাঁওতালদের মাঝে ইংরেজি নাম রাখার প্রচলন শুরু হয়। খ্রিস্টান সাঁওতালদের মাঝে জ্যাকব, ফিলিপ, ডেভিড, আলফ্রেড–নামগুলো এখন অহরহই শোনা যায়। তারা এখন তাদের শিশুদের নাম ইংরেজিতে রাখতেই বেশি পছন্দ করে। সন্তানের নাম রাখার আগে তারা চার্চের ধর্মগুরুর সাথে আলোচনা করে নেয়।

কিছু অখ্রিস্টান সাঁওতালও কিছু ক্ষেত্রে পশ্চিমা নাম গ্রহণ করছে। আমরা লিওনার্দো ও স্তেফান নামের দুজন সাঁওতাল ছেলের দেখা পেয়েছিলাম, যারা খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ছিল না।

সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য ধ্বংসের পেছনে মিশনারিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। খ্রিস্টধর্ম সাঁওতালদের জীবনধারাকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে এবং তাদের আদি জীবনধারা থেকে তাদের অনেক দূরে সরিয়ে এনেছে। ফলে মিশনারিদের দ্বারা সাঁওতালদের এই ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়াকে অসাঁওতালীকরণ কিংবা বৃহৎ অর্থে অগোত্রীকরণ প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।[৩০]

৬.৫ বিশ্বায়নের প্রভাব এবং নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত বিচ্যুতি

বিশ্বায়নকে আমরা 'বৈশ্বিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রস্তাবনা' হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি, যেখানে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে (যেমন–স্যাটেলাইট প্রযুক্তির বিকাশ, ভোগবাদ ও নগরায়ণের বিকাশ ইত্যাদি) একটি বৈশ্বিক সংস্কৃতি গড়ে উঠবে।[৩১] বিশ্বায়ন মুক্তবাজার ও মুক্ত বাণিজ্যের কথা বলে, অর্থাৎ বিশ্বায়নের একটি নিজস্ব অর্থনৈতিক গতি আছে। অর্থনৈতিক ধারার পাশাপাশি এর একটি সাংস্কৃতিক ধারাও আছে।[৩২] বিশ্বায়নের মাধ্যমে পশ্চিমারা একটি সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি ইউরোপের সাংস্কৃতিক ধারাকে অনুসরণ করার মাধ্যমে পশ্চিমা সংস্কৃতির আদলে একটি একরূপী বৈশ্বিক সংস্কৃতি তৈরি হবে। পুরো বিশ্বের সাংস্কৃতিক ধারায় একরূপতা এলে বিশ্বব্যাপী ভোগের ধরনও একই রকম হবে।[৩৩] ফলে বিশ্বজুড়ে পশ্চিমা পণ্যের নতুন ভোক্তা ও বাজার তৈরি হবে। এতে প্রাচ্যের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে সেখানে পশ্চিমা ভাবাদর্শের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। পশ্চিমা সংস্কৃতির পেছনে বড় আকারের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার জোর থাকায় দুনিয়াজুড়ে এটি বেশ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতির ফলে এর বিকাশ ও বিস্তৃতি আরও অনেক সহজ হয়ে গেছে। বিশ্বায়নের প্রভাব নিয়ে কেউ কেউ শঙ্কিত হবে, কেউ ক্ষতির শিকার হবে আবার কেউ কেউ এই প্রক্রিয়া থেকে লাভবানও হবে; মোটকথা সবাইকে এই প্রক্রিয়ার মাঝেই থাকতে হবে। কেউ এই প্রক্রিয়ার বাইরে থাকবে সেটা চিন্তা করাটা প্রায় অসম্ভব।[৩৪]

> সাঁওতালদের ঘর সাধারণত কাদামাটির তৈরি এবং আকারে ছোট হয়। তাদের উঠান যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সাঁওতাল নারীরা নানা রকম ছবি এঁকে এবং নকশা করে ঘরের দেয়ালগুলো সাজিয়ে তোলে। তাদের ঘরের আসবাবপত্র বেশ সাদামাটা।

আগে এমন অনেক দূরবর্তী জায়গা ছিল, যেখানে কোন জনবসতি ছিল না। তবে এখন বলতে গেলে সব অঞ্চলেই মানুষের পায়ের ছাপ পড়েছে। তাই ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলো কোন জায়গায় গিয়ে নিজেদের মত করে থাকবে সে রকম সুযোগ এখন আর নেই। এছাড়া আদিবাসী এলাকাগুলোতে মূলধারার জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ বাড়ার কারণে সেখানে নগর আগ্রাসনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আদিবাসীদের শান্ত-সৌম্য জীবনধারা এখন অনেকটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সাঁওতালদের মত আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোকে এখন মূলধারার জনগোষ্ঠীর সাথে বসবাস করতে হচ্ছে। এতে মূলধারার জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছে। আর মূলধারার জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি (বাঙালিদের) যেহেতু পশ্চিমা প্রভাবযুক্ত (বিশ্বায়নের কারণে), তাই সাঁওতালদের সংস্কৃতিতেও পরোক্ষভাবে পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটছে। আমাদের গবেষণার এলাকাগুলোতে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলোও অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ভাবধারা থেকে অনুপ্রাণিত; তাই এই প্রকল্পগুলোও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে বলে ধরে নেয়া যায়।

বিশ্বায়নের একটি সাদামাটা ফলাফল হল সাঁওতালদের মত আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে সেখানে ভোগবাদী মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটা। বর্তমানে সাঁওতালদের মাঝে ভোগবাদী আচরণের উদ্ভব ও বিকাশ বেশ ভালভাবেই ঘটছে। সাঁওতালদের ব্যয় ও ভোগের ধরন এখন শহুরে লোকজনের মত হয়ে যাচ্ছে (যদিও এটি এখনও বেশ প্রাথমিক পর্যায়ে আছে)। আমরা দেখেছি, সাঁওতালরা এখন ইংরেজি নববর্ষ পালন করে, পশ্চিমা ধাঁচের পোশাক পরে এবং কথা বলার সময় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে। তাদের অনেকেই এখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। আমরা সাঁওতাল ছাত্রদের পড়ার রুমে হিন্দি সিনেমার তারকাদের ছবি ঝুলতে দেখেছি। তাদের অনেকেই সমসাময়িক জনপ্রিয় বাংলা গানের সাথে পরিচিত। কিছু সাঁওতাল বাড়িতে আমরা টেলিভিশনও দেখেছি।

৬.৬ রাষ্ট্রের ভূমিকা : জাতীয় একাত্মতা বনাম সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

রাষ্ট্রে বসবাসরত বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিজস্ব সাংস্কৃতিক চর্চা আছে। এগুলোর বিকাশ ও সংরক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।[৩৫] কিন্তু আমাদের সামনে থাকা বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাষ্ট্র নিজেই সাঁওতাল সংস্কৃতি ও অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী অংশে আমরা আলোচনা করেছি ঔপনিবেশিক সরকার কেন এবং কীভাবে সাঁওতালদের মাঝে খ্রিস্টধর্ম বিস্তারে সহযোগিতা করেছিল। এখন আমরা দেখব ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর আবির্ভূত দুই রাষ্ট্র (পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) আদিবাসীদেরকে (সাঁওতালদের) তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও পরিচয় থেকে বিচ্যুত করার ব্যাপারে কী ভূমিকা রেখেছিল।

১৯৪০ সালে তথাকথিত দ্বিজাতি তত্ত্ব উপস্থাপনের পর ইসলামি জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে একটি বিভাজন সৃষ্টি করে, যা পরবর্তীতে একটি অনিবার্য সংঘাতে পরিণত হয় এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ নেয়।[৩৬] ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর মৌলবাদী ইসলামি দলগুলোর প্রভাবে পাকিস্তানি জনগণের মাঝে ভারতবিদ্বেষ ও হিন্দুবিদ্বেষ বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ফলে পাকিস্তানে ইসলামি জাতীয়তাবাদ ধর্মীয় উগ্রতায় রূপ নেয় এবং সমাজে হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তৈরি হয়। আদিবাসীরাও (সাঁওতালরা) এই বিদ্বেষ থেকে বাদ পড়েনি।[৩৭]

সাঁওতালদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় আছে, যা মূলধারার জনগণ থেকে আলাদা। এই পরিচয়ের কোন বস্তুগত অস্তিত্ব নেই, তবে এটি উপলব্ধি করা যায়। নানা অভিজ্ঞতা, ভাবনা-ধারণা, জাতিগত অতীত, ইতিহাস এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ মিলিয়ে একটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব পরিচয় তৈরি হয়।[৩৮] পাকিস্তানের রাষ্ট্রব্যবস্থা এরূপ নিজস্বতার বিরুদ্ধে ছিল। চরমপন্থি ইসলামি

জাতীয়তাবাদ চালিত পাকিস্তান শুরু থেকেই ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করত। ফলে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরা (সাঁওতাল) নিজেদের সেখানে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু হিসেবে আবিষ্কার করে। খ্রিস্টধর্ম যেহেতু বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলো দ্বারা সমর্থিত ছিল, তাই এটি তখন সাঁওতালদের জন্য একটি রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে 'খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ' তখন সাঁওতালদের মাঝে ব্যাপক নৈতিক সমর্থন ও প্রাধান্য লাভ করে। দেশভাগের পূর্বে ব্রিটিশ শাসকরা সাঁওতালদের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ তৈরির জন্য তাদের ধর্মান্তরিত হতে প্রলুব্ধ করেছিল। কিন্তু দেশভাগের পর অর্থাৎ পাকিস্তান শাসনামলে পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল। তখন এ অঞ্চলের শাসনভার ছিল পাকিস্তানের মূলধারার সংখ্যাগরিষ্ঠদের (মুসলমানদের) হাতে। প্রথম থেকেই তারা আদিবাসীদের প্রতি শোষণ ও নিপীড়নমূলক নীতি অনুসরণ করে আসছিল। যেহেতু আদিবাসীদের পরিচয় ও সংস্কৃতি মূলধারা থেকে ভিন্ন, তাই বিভিন্ন সময় তাদের দিক থেকে নানা ধরনের দাবি উঠবে এবং আন্দোলন তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে–এমন চিন্তা থেকে এ ধরনের সম্ভাবনা রোধ করার জন্য রাষ্ট্র তাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্র মূলধারার মুসলিমদের মাঝে (ধর্মীয়) স্বাজাত্যবোধকে উৎসাহিত করা শুরু করে। এতে আদিবাসীদের প্রতি মূলধারার জনগণের ঘৃণা ও বিদ্বেষ বাড়তে থাকে। সে সময় খ্রিস্টান মিশনারিদের সাথে সম্পৃক্ততা থাকার ফলে সাঁওতালরা রাষ্ট্রের এই বিদ্বেষমূলক ও আগ্রাসী মনোভাব থেকে কিছুটা রক্ষা পায়।[৩৯] রাষ্ট্রের এরকম আচরণ সে সময় মিশনারিদের খ্রিস্টধর্ম প্রসারের কাজকে বেশ সহজ করে দেয়।

নতুন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশর অভ্যুদয় এসব সমস্যার একটি টেকসই সমাধান হতে পারত। শুরুতে বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছিল। এর সংবিধানে ধর্মীয় রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ছিল।[৪০] কিন্তু সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করা হলেও সেটি আদিবাসীদের পরিচয় ও জাতীয়তা নিয়ে সৃষ্ট বিতর্ক নিরসনে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।[৪১] বাহাত্তরের মূল সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছিল। এর নবম অনুচ্ছেদে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল : "ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতাসংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের ভিত্তি হবে বাঙ্গালী জাতির ঐক্য ও সংহতি–যেটি উদ্ভূত হয়েছে এর ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে।" নিঃসন্দেহে তখন এদেশে এমন অনেক গোষ্ঠী ছিল (বিশেষ করে আদিবাসী গোষ্ঠী), যারা বাংলায় কথা বলত না এবং যাদের সংস্কৃতিও ছিল মূলধারার সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র। সুতরাং এভাবে সকল নাগরিকের ওপর বাঙালি জাতীয়তাবাদকে চাপিয়ে দেয়ার অর্থই ছিল আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর সাংস্কৃতিক অনন্যতা এবং জাতিগত পরিচয়কে অস্বীকার করা।[৪২] সংবিধানের এই অনুচ্ছেদগুলো রাষ্ট্রে বাঙালিদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য নিশ্চিত করেছিল। এর ফলে রাষ্ট্রে বসবাসরত আদিবাসী গোষ্ঠীর সাথে রাষ্ট্রের এক ধরনের বিভেদ তৈরি হয়। সে সময় জাতীয় রাজনীতিতে যেসব পরিবর্তন এসেছিল সেগুলোও এই সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়েছিল। আদিবাসী এলাকায় বাঙালি মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে সেখানে কোন ধরনের অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা থাকবে না–এমন চিন্তা থেকে সামরিক শাসনামলে মুসলিম বাঙালিদের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বসতি স্থাপনের ব্যাপারে উৎসাহ জোগানো হয়।[৪৩] এটি ছিল একটি রাজনৈতিক সমস্যার সামরিক সমাধান।[৪৪] উপরন্তু সামরিক শাসন রাজনীতিতে আমলতন্ত্র টেনে আনার ফলে মুসলিম মৌলবাদীদের রাজনীতিতে প্রবেশের পথ সুগম হয়।[৪৫] এর ফলে একসময় রাষ্ট্র তার ধর্মনিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য হারানোর পাশাপাশি আদিবাসীরাও তাদের শেষ রক্ষাকবচটি হারায়।[৪৬]

রাজনীতিতে ধর্মচর্চা মানুষকে সংকীর্ণ ও একরোখা করে তোলে। রাষ্ট্র বাঙালি মুসলমানদের সামনে সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক (মুসলিম স্বাজাত্যবোধ) মতবাদ তুলে ধরার ফলে সমাজে সাঁওতালদের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে। এরকম বিরূপ অবস্থায় মিশনারিরা বড় আকারের অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সাহায্য নিয়ে সাঁওতালদের পাশে এসে দাঁড়ায়। ফলে সাঁওতালদের মাঝে চার্চের একটি শক্তিশালী ইমেজ গড়ে ওঠে। প্রতিকূল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে থাকা সাঁওতালরা অনুভব করে, টিকে থাকার জন্য জাতিগত পরিচয়ের চেয়ে একটি শক্তিশালী ধর্মীয় পরিচয় তাদের জন্য বেশি প্রয়োজনীয়; এবং এই ভাবনা থেকে তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ শুরু করে। রাষ্ট্রও তাদের ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় কখনও বাধা দেয়নি, কারণ রাষ্ট্রের বিশ্বাস ছিল সাঁওতাল সমাজে খ্রিস্টধর্মের প্রসারের ফলে সাঁওতালদের নিজস্ব সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে; ফলে তাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের প্রশ্নটাও আর তেমন গুরুত্বের সাথে সামনে আসবে না।[৪৭]

যে কোন গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনে ভাষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রাষ্ট্র বর্তমানে সাঁওতালদের নিজেদের ভাষায় শিক্ষা গ্রহণে কোন প্রকার সহযোগিতা করে না। সাধারণত সাঁওতাল শিশুরা অন্য শিশুদের তুলনায় দেরিতে স্কুলে যাওয়া শুরু করে। কারণ যে বয়সে অন্য শিশুরা স্কুলে যাওয়া শুরু করে, সেই বয়সে সাঁওতাল শিশুরা বাংলা শিখে ওঠে না। যেহেতু স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হয়, তাই সাঁওতাল শিশুদের কিছুটা বাংলা শিখে তারপর স্কুলে যাওয়া শুরু করতে হয়। সাঁওতালরা এখন তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ দাবি করছে (সাঁওতাল ভাষায়–গোগো আংরাতে পারহা এয়া ছাদে)। মাঠকর্মের সময় আমরা দেখেছি, প্রাপ্তবয়স্ক প্রায় সকল সাঁওতালই বেশ সাবলীলভাবে বাংলা বলতে পারেন। যেহেতু বসতভিটা ত্যাগ করে তাদের এখন বাঙালিদের সাথে বসবাস করতে হচ্ছে, তাই বাঙালিদের সাথে তাদের যোগাযোগও অনেক বেড়েছে। তবে বাঙালিরা সাঁওতাল ভাষা বোঝে না, তাই যোগাযোগের খাতিরে সাঁওতালদেরই বাংলা ভাষা শিখে নিতে হয়েছে। এভাবেই সাঁওতাল সংস্কৃতির মাঝে বাঙালি সংস্কৃতি ঢুকে পড়ছে। সাঁওতালদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান পেশা কৃষি হওয়ায় তাদের জীবনধারা ও সংস্কৃতির অনেকটাই জমির সাথে সম্পৃক্ত। রাষ্ট্র তাদের গোত্রভিত্তিক মালিকানাকে স্বীকৃতি দেয়নি, যার ফলে তাদের জমি সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন, প্রথা ও সংস্কৃতিও ভেঙে পড়েছে এবং সেখানে মূলধারার সংস্কৃতির বিকাশ ঘটছে।[৪৮]

রাষ্ট্র অনেক ক্ষেত্রেই জনগণের কাছে আদিবাসীদের জীবনধারা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বাঁধাধরা ও অতিসরলীকৃত তথ্য প্রচার করে; তাই মূলধারার জনগণও আদিবাসীদের বিভিন্ন ব্যাপার ভালভাবে জানতে পারে না। যতটুকু জানে সেটুকুও দেখা যায় খণ্ডিত, বানানো কিংবা অতিরঞ্জিত তথ্য (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে)। এরকম প্রচারণার ফলে আদিবাসীদের সম্পর্কে জনগণের মনে বিরূপ ধারণা তৈরি হয়। ফলে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সরকার/রাষ্ট্রের নেয়া নিপীড়মূলক নীতি ব্যাপক

জনসমর্থন লাভ করে এবং তখন তাদের ওপর শোষণ ও নিপীড়ন চালানো রাষ্ট্রের জন্য বেশ সহজ হয়ে যায়।

৬.৭ উপসংহার

নিঃসন্দেহে আমাদের উন্নয়ন প্রয়োজন। তবে টেকসই উন্নয়নের নীতি মানতে হলে লাভ-ক্ষতির হিসাব করাটাও জরুরি। উন্নয়নের সময় 'কে এই উন্নয়ন থেকে লাভবান হবে এবং কে এই উন্নয়নের ব্যয় বহন করবে'–এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা দরকার। সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি সুবিচার না করে কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে উন্নয়ন হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। উন্নয়নের হিসাবে প্রান্তিক মানুষদের কান্না ও আহাজারিকে আমলে নেয়া দরকার। আমরা দেখতে পাচ্ছি, উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে সংঘটিত 'উচ্ছেদ/স্থানান্তরকে' উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটি সহজেই বোঝা যায় যে পুনর্বাসনের পর অনেক ক্ষেত্রেই মৌলিক অবকাঠামো সুবিধা, যেমন–রাস্তাঘাট, যোগাযোগব্যবস্থা, বাজারঘাট ইত্যাদির উন্নয়ন ঘটবে। তবে এর বিপরীত চিত্রও আমাদের মাথায় রাখতে হবে–যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি এবং নগরায়ণের ছোঁয়া যে কেবল সুযোগ-সুবিধাই বাড়াবে তা কিন্তু নয়। এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফলে যদি সমাজের বিভিন্ন স্তরের সদস্যদের অর্থনৈতিকভাবে সমাজের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যাওয়ার সুযোগ তৈরি না হয় তাহলে সেটি এক পক্ষের জন্য যেমন উচ্চাশা বাড়াবে, তেমনি অন্য পক্ষের জন্য হতাশা বাড়াবে। এছাড়া বসতভিটা থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে যে ফাটল দেখা দেয় সেটিকে কোনভাবে ঠিক করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

শ্রমবাজারে প্রবেশ সহজসাধ্য হয়ে উঠার ফলে বিভিন্ন পেশা কিংবা চাকরিতে প্রবেশের সুযোগ বেড়েছে। তবে এই সুযোগগুলো সেভাবে সাঁওতালদের হাতের নাগালে আসেনি; ফলে সাঁওতালদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকাটা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই কাজের সুযোগ বৃদ্ধি সাঁওতালদের তেমন কোন উপকারে আসেনি, বরং এটি তাদেরকে শোষণের একটি উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সাঁওতালদের সংস্কৃতি তাদের জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা সাঁওতালদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সংস্কৃতি তাদের পরিচয় ও অস্তিত্ব। বর্তমানে সাঁওতাল সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন হবার পথে–এটি এখন খ্রিস্টান সংস্কৃতি এবং মূলধারার বাঙালি সংস্কৃতির মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে। খ্রিস্টধর্ম সাঁওতাল সমাজে নতুন প্রথা, চর্চা, বিশ্বাস ও রীতিনীতি নিয়ে এসেছে; আর বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া সাঁওতাল সমাজে পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুপ্রবেশকে ত্বরান্বিত করেছে এবং সাঁওতাল সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে বিলীন করে দিচ্ছে। সব শেষে রাষ্ট্র তার চরমপন্থি জাতীয়তাবাদী মনোভাবের মাধ্যমে রঙিন সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে অগ্রাহ্য করে দেশজুড়ে একটি একরূপতা আনার চেষ্টা করছে। এই ত্রিমুখী আক্রমণের (খ্রিস্টধর্ম, বিশ্বায়ন, চরমপন্থি জাতীয়তাবাদ) ফলে সাঁওতাল সংস্কৃতি আজ বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত।

জায়েদ বিন সাত্তার : স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থী, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ইমেইল : jayedsatter@gmail.com

(এই অনুবাদটি করার সময় ভাষা ও ভাবগত বিন্যাস ঠিক করার জন্য সহযোগিতা করেছে বন্ধু শিমন তালুকদার ও রাফিয়া ইসলাম। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।)

তথ্যসূত্র (আগের সংখ্যার পর)

১৫. Principles of marketing. 11th edition 2005, Prientice-Hall of India, New Delhi, PP:134-167

১৬. Oxford Learner's Dictionary, 6th edition, 2004-05, definition of culture

১৭. Azad Humayun, Parbatya Chattagram; Shabuj Paharer Bhetar Diye Probahita Hingshar Jharnadhara, Agami Publication, 2004, P-39

১৮. Fridah Muzale-Manenji., The effects of globalization of culture in Africa, in the eyes of an African woman. See in http://www.wcc-coe.org/wcc/what/jpc/effglob:htmlhttp://www.wcc-coe.org/wcc/what/jpc/effglob:html

১৯. Pandey GD., Demographic Characteristics of Tribal and not-tribal females: comparative study; in 'Man in India', 1994, March 74(1), 39-47

২০. See Asiatic Society of Bangladesh, Banglapedia,Voll-IX, 2003, P-62

২১. Supra note 18, P-5

২২. Supra note 18, P-13

২৩. See Asiatic Society of Bangladesh, Banglapedia, Vol-9, 2003, P-3

২৪. Supra note 18, PP: 34-65. 2003, P-63

২৫. Asiatic Society of Bangladesh, Banglapedia, Vol-3, P-17

২৬. See Supra note 69, P-18

২৭. Ibid, P-18

২৮. Supra note 19, P-30. CLR work on Santals

২৯. Supra note 19, P-47. CLR work on Santals

৩০. Ibid, P-48

৩১. See, Oxford dictionary of Sociology, 2nd edition, 1998, P-258

৩২. Rothcop, David., In praise of cultural imperialism? Effects of Globalization on culture. See www.globalpolicy.ogr.com

৩৩. Reza, Syed Masud. Subordinated cultural of Garos, in Rahaman, Prof. Dr. Mizanur (ed.), The Garos: struggling to survive in the valley of death, ELCOP, 2006, P-99

৩৪. Supra note 80, P-1

৩৫. Ahmed Kawsar., Dissolution of the ethnic and subordination of the kasis to dominant culture, In Rahman Prof. Dr. Mizanur (ed.): combating the khasi uprooting: Humanity cries, ELCOP, 2004, P-288

৩৬. Supra note 65, Vol-II, 2003, P-347
37. Supra note 86, P-280

৩৮. Gottschalk peter., Beyond Hindu and Muslim: Oxford University Press, New Delhi, 2001, PP: 65-102. Cited in supra note 86 P-103

৩৯. Supra note 86, P-282

৪০. The constitution of People's Republic of Bangladesh Constitution-1972: Article 12

৪১. Chakma, MongalK., 'Chittagong Hill Tracts issue: Past, Present and Future, in Bipanza Bhumjya: Astitter Sankate adivasi samaj', edited by Mesabah Kamal and Arefatul Kibria, RDC, Dhaka 2003, P-244, cited in Supra note 86, P-283

৪২. Supra note 18, P-50

৪৩. Supra note 61, P-22

৪৪. Ibid: P-22

৪৫. See Oxford dictionary of Sociology, 2nd edition, 1998

৪৬. Amendment of constitution in 1977 (article 2A) and 1988 (article 8)

৪৭. Supra note 81, P-119

৪৮. Kamal Mesbah, Chacraborti Ishani, Nasrin Jobaida, Nijbhume parabashi; uttobanger Adivasir prantikata discourse; RDC; 2001, P-50